

জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস পাঠ ও বিবেচনা

আহমেদ মাওলা

☀️ তাম্রলিপি

জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস: পাঠ ও বিবেচনা
আহমেদ মাওলা

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

তাম্রলিপি:

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ফ্রব এষ

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
একতা প্রিন্টার্স
৩৭ আর. এম. দাস রোড, ঢাকা-১১০০।

মূল্য: ৬০০.০০

By: Ahmed Mowla
First Published : February 2022 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
Price: 600.00 \$ 13
ISBN :

উৎসর্গ

মোহাম্মদ আজম

প্রিয় অনুজ

আমাদের নির্বোধ সমাজে চেরাগ জ্বালানিয়া কণ্ঠস্বর।

পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।
...মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হত অনুভব করৈ
এসে যে গভীরতর লাভ হ'ল সে-সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে,
দেখেছি যা হ'ল হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাস্ত্রত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।
—জীবনানন্দ দাশ

ভূমিকা

কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) কী উপন্যাস লিখেছেন? অথবা গল্প? তাহলে কেন প্রকাশিত হলো না সে সব গল্প-উপন্যাস তাঁর জীবদ্দশায়? এ জিজ্ঞাসা নিরন্তর তাড়িয়ে বেড়ায় অনেক পাঠককে। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই আমি জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে ছুটে বেড়িয়েছি অনেক জায়গায়। জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর অনেকদিন পর, গুপ্ত ধনের মতো ট্রান্স্ক ভর্তি খাতাগুলোর মধ্যে আবিষ্কৃত হলো প্রায় আটশ কবিতা, (জীবদ্দশায় প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা মাত্র ২৬২টি, মৃত্যুর পর মুদ্রিত হয় প্রায় সাতশটি) প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠার ডায়েরি, ‘লিটারারি নোটস’ ইংরেজি বাংলা মিলিয়ে ৬০টি প্রবন্ধ, দেড়শ’র মতো গল্প এবং ১৮টির (মতান্তরে ২২টি) মতো উপন্যাস। এ তথ্য পাঠকসমাজকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দেয়। উপন্যাসে তিনি জীবন সম্পর্কে কিছু অমীমাংসিত প্রশ্ন এবং মৌলিক জিজ্ঞাসার অবতারণা করেছেন, যা সত্যি কৌতূহল উদ্দীপক এবং দার্শনিকতায় উত্তীর্ণ। তাঁর উপন্যাসে সম্পূর্ণ বিরল, ব্যতিক্রমধর্মী ভাবনার উপস্থিতি দেখে অনুরাগী পাঠক বিস্মিত হবেন। খুঁজে পাবেন নতুন এক জীবনানন্দকে। মনে হবে, তিনি শতাব্দীর বিস্ময়কর ভাবুক এবং অ্যাথেনোগ্রাফিক পর্যবেক্ষক।

রবীন্দ্র-উত্তরকালের বাংলা কবিতার সর্বাধিক প্রভাব সঞ্চারী কবি জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দের কবিতার অর্থ পূর্ণতা, রহস্যময় মোহন ইশারা পাঠককে ভিন্ন এক বোধ ও ভুবনের দিকে নিয়ে যায়। তাঁর কবিতার সর্বগ্রাসী ভাব ও ভাষা, নিসর্গের রং-রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শময় অনুভূতি, ক্লান্তি ও বেদনা হৃদয়ে দ্রবীভূত হয়। জীবনানন্দের কবিতা এমনই ‘সবুজ-করণ ডাঙ্গায়’ উপনীত করে পাঠককে। তাঁর স্থির, স্থায়ী কবি-পরিচিতির বাইরের কথাসাহিত্যিক বা ঔপন্যাসিক হিসেবে জীবনানন্দের উপস্থিতি সত্যি বিস্ময়ের

জন্ম দেয় বৈকি। কারণ, কবিতার বিপরীত মেরুর শিল্প, উপন্যাস। উপন্যাস হচ্ছে শাখা-প্রশাখা সমাচ্ছন্ন বহু স্তরীভূত জীবনের কলস্বর। পল্লবিত কথা বিস্তারেই তার অভিযাত্রা। অন্যদিকে কবিতা হচ্ছে, মিত বাক, অধিবাস্তবতার বিনির্মিত শিল্প। আঙ্গিক ও স্বভাবগত এই বৈশিষ্ট্যের কারণে কবিতা এবং উপন্যাস জন্ম থেকেই পৃথক, আলাদা পথেরই অভিযাত্রী। কিন্তু কখনো যদি কবি ও কথকের সম্মিলন ঘটে, একই ব্যক্তিতে শিল্পের দুরকম উৎসারণ হয়—যেমন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ শামসুল হকের ক্ষেত্রে ঘটেছে, তখন সব্যসাচি বলেই তার প্রতিভাকে মহিমান্বিত করা হয়। তবে, জীবনানন্দের ক্ষেত্রে? কবি পরিচয়ই যার সার্বভৌম, ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁকে আবিষ্কার ও উপস্থাপন অভিনতুন বলতে হয়। কিন্তু অসঙ্গত কী? ঔপন্যাসিক হিসেবে জীবনানন্দকে পাঠ করার, বোঝার, বিশ্লেষণ করার প্রয়াস থেকেই এই গ্রন্থ। জীবনানন্দের উপন্যাস এমনই বিরল এবং ব্যতিক্রমধর্মী যে, পাঠকের পূর্বপ্রচল সমস্ত ধারণা বদলে দেবে বলে আমার বিশ্বাস।

আহমেদ মাওলা

বাংলা বিভাগ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা।

Mowla.bangla@gmail.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	১১
জীবনানন্দ দাশ : উপন্যাস পাঠের ভূমিকা	১১
জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস পাঠ : কতিপয় জিজ্ঞাসা	২১
দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রথম পর্বের উপন্যাস	২৭
নভেলের পাণ্ডুলিপি/ সফলতা-নিষ্ফলতা : ব্যক্তিসত্তার উন্মোচন	২৭
পূর্ণিমা : মৃত্যুর অন্ধকারে ঢেকে যায় জীবন	৩৫
বিভা : জীবনের অমীমাংসিত সমীক্ষা	৩৮
কারুবাসনা : শিল্প ও জীবনের দ্বৈরত	৪৫
নিরুপম যাত্রা : প্রভাতের মৃত্যু ও তুলনাহীন যাত্রা	৫৬
কল্যাণী : সুন্দরের সঙ্গে অসুন্দর মিলন আধুনিকতার ভয়াবহ অসঙ্গতি	৬০
মৃণাল : অচরিতার্থ জীবনের প্রেম	৬৬
বিরাজ : জীবনের খণ্ডাংশ	৬৯
জীবনপ্রণালি : অর্থ সংকটে পর্যুদস্ত জীবন	৭১
জীবনযাপন/ জীবনের উপকরণ : শিল্প ও জীবনের নবনিরীক্ষা	৭৫
প্রতিনিীর রূপকথা : চেতন-অবচেতন মনের অধরা মানসী	৮৩
জ্যোতি : অর্থ ছাড়া জীবন আলোহীন	৮৮
অতসী : ইহজাগতিকতা ও নিরশ্বরবাদী চেতনা	৯৩
আমরা চারজন : অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার জীবন	৯৮
তৃতীয় অধ্যায় : দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস	১০৭
মাল্যবান : দাম্পত্য সংকটের মনোদৈহিক টানাপোড়েন	১০৭
সুতীর্থ : উপনিবেশিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ন্যারেটিভস্	১১৯
জলপাইহাটি : মফস্সলের জীবনবৃত্তান্ত	১২৪
বাসমতী উপাখ্যান : দেশভাগ ও জীবনানন্দের জীবন	১২৯
পরিশিষ্ট	১৩৭
জীবনানন্দ দাশের জীবন ও সাহিত্যকর্ম	১৩৭
প্রাসঙ্গিক তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জি	১৬৫

প্রথম অধ্যায়

জীবনানন্দ দাশ : উপন্যাস পাঠের ভূমিকা

জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে উন্মোচিত ও আবিষ্কৃত হলো তাঁর আত্মপ্রকাশের দ্বিতীয় ক্ষেত্র-ঔপন্যাসিক সত্তা। গবেষকদের অবিরাম প্রচেষ্টা আর অন্বেষণের ফলে জানা যায়, জীবনানন্দ দাশ আসলে যুগপৎ কবি ও ঔপন্যাসিক ছিলেন। পাঠকদের জন্য এই এক নতুন বিষয়। তাঁর উপন্যাস পাঠ করলে একটি প্রশ্ন মনে ঘুরপাক খায়, জীবনানন্দের কবিতা এবং উপন্যাস কী পরস্পরের পরিপূরক? জীবনানন্দের কবিতার অন্তরঙ্গ পাঠকের কাছে এ জিজ্ঞাসা মোটেও গৌণ নয়। আরো একটি গাঢ় প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়, প্রায় আড়াই হাজার পৃষ্ঠার মতো, অনেকগুলো উপন্যাস লিখলেও কেন জীবদ্দশায় তাঁর একটিও উপন্যাস প্রকাশিত হলো না? অথবা কেন প্রকাশ না করে ট্রান্সভর্তি করে রেখে দিলেন? এসব জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে জীবনানন্দের জীবনের দিকেই আমাদের ফিরে তাকাতে হয়। উঁকি দিতে হয় তাঁর বেড়ে ওঠা সমাজ, সময়, সাহিত্য-মানস, অধিত বিদ্যা, অভিজ্ঞতার ভুবনের দিকে। জীবনানন্দ দাশ যখন উপন্যাস লিখছেন তখন ভারতবর্ষ ছিল উত্তাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত অর্থনৈতিক মন্দা, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, কল্লোল (১৯২৩), কালি কলম (১৯২৪) শনিবারের চিঠি (১৯২৪) পরিচয় (১৯৩১) পূর্বাশা (১৯৩২) কবিতা (১৯৩৫) পত্র পত্রিকার প্রকাশ। কলকাতার তখনকার সাহিত্যিক আবহ ছিল রবীন্দ্র-দ্রোহ, প্রবলভাবে 'ইউরোসেন্টিজম' 'কলোনিয়ালিজম' 'মডার্নিজম' 'মাস্ট্রীয় আদর্শ' ইত্যাদির প্রবল প্রতাপ। কলকাতার সাহিত্যিক মহলে তখনো জীবনানন্দ দাশ কবি হিসেবে তেমন একটা সমাদৃত হননি। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর কাছে গ্রন্থ পাঠিয়ে আলোচনার অনুরোধ করেছিলেন তিনি কিন্তু অগ্রজ দুই লেখক সময় দিতে পারেননি। সমকালীন মনস্বী সমালোচক অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আবু সায়ীদ আইয়ুব, জীবনানন্দ সম্পর্কে নিঃশব্দ ছিলেন। শনিবারের চিঠি, পত্রিকায়

সজনীকান্ত সেন আমৃত্যু জীবনানন্দ দাশকে ক্রমাগত আক্রমণ, ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ করেছেন। বার বার চাকরিচ্যুত হয়ে বেকার, ব্যর্থ, বিপর্যস্ত অবস্থায় দিনযাপন করেছেন। সমসাময়িক কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ছিলেন কেবল জীবনানন্দের কবিতার প্রতি অনুরাগী এবং সহানুভূতিশীল। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯) ও ময়নামতি (১৯৪৩), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাগ (১৯৪৭) পরবর্তী জীবনানন্দের কলকাতার জীবন ছিল দুর্বিষহ, যন্ত্রণাদায়ক ছিল। শিক্ষক পিতা এবং মাতা কবি কুসুমকুমারীর কোলে জন্ম নেয়া ও বেড়ে ওঠা জীবনানন্দের মানস গঠনের ছবি স্পষ্ট। কল্লোল পত্রিকায় তিনি কবি হিসেবে উত্থাপিত হলেও কল্লোল ছিল মূলত কথাসাহিত্যের পত্রিকা এবং আধুনিকতাবাদী ও মার্ক্সীয় চেতনা পুষ্ট পত্রিকা। এই দুই আদর্শের কোনোটির প্রতি জীবনানন্দ আকৃষ্ট হননি। তিনি জীবন, জগৎ, সমাজ, সময়, সভ্যতাকে বোঝার চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞান ও ইতিহাসের পটভূমিতে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার সভ্যতাকে এগিয়ে নিলেও আধুনিক সভ্যতার এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভরতার পরিণতি যে খুব ভয়াবহ হবে, সেটা তিনি জেনেছেন ইতিহাসে উঁকি মেরে। তিনি দেখেছেন কেবল দুঃখ আর বিপন্নতা। এভাবে তিনি সভ্যতাকে পরিমাপ করেছেন, দুঃখের শুষ্কতা আর তিমির হননের সূর্যোদয়ের কথা বলেছেন কবিতায় ও কতকথায়। জীবনানন্দের পাঠ পরিধি কেবল সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যাপ্ত ছিল। ব্যক্তিগত জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত বেকারত্ব তাঁকে প্রায় ব্যথিত, বিচলিত করেছে। তাঁর অধিকাংশ রচনায় ধূসরতা, সংশয়, ব্যথিত, বিচলিত বোধ উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে। 'উপনিবেশিত' 'ওয়েস্টার্নাইজ' 'মডার্নাইজ' সভ্যতার দিকে তাকিয়ে তিনি দেখেছেন, পৃথিবীর একদিকে উন্নয়ন, স্পন্দন, গতি, উদ্যম, দুর্বীর গতিতে এগিয়ে যাওয়া অন্যদিকে সংঘাত, সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, বিমানবিকতা, শত শত শূকরের চিৎকার, মুমূর্ষু আত্মার ক্রন্দন, উবশীর মাংস বাদুড়ে খায়, রূপসির সঙ্গে কুৎসিত লোকের ভয়াবহ সঙ্গম-এসব অসঙ্গতি ও অন্তর্বিরোধ তিনি কবিতায় তুলে ধরেছেন। কিন্তু উপন্যাস? কোন অনুপ্রেরণা থেকে জীবনানন্দ উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন? তার উৎসমূল বোঝার দরকার আছে।

কল্লোলের জীবনানন্দের সতীর্থ লেখক-কবিদের অনেকেই সব্যসাচী-অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু একই সঙ্গে কবি ও কথাসাহিত্যিক হিসেবে খ্যাত ছিলেন। জীবনানন্দও তাঁদের সহযাত্রী হবার আকাঙ্ক্ষা থেকে উপন্যাস রচনা শুরু করেছিলেন কী?

১৯৩০ সালে বিয়ের পরপর যখন চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে মুখ খুবড়ে পড়েছিলেন, (১৯৩০ থেকে ১৯৩৪) সে সময় একে একে অনেকগুলো উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি। আবার ১৯৪৮ এর দিকে নতুন করে বেকারত্বের দিনগুলোতে পর্যুদস্ত অবস্থায় লিখেছেন কয়েকটি উপন্যাস।

উপন্যাস লিখলেন কিন্তু একটাও ছাপালেন না কেন? লিটারারি নোটস্-এ তিনি লিখেছেন-

I dont know what would be the proper literary line for me and attempt to write novels may man heartless wastage and uncharted sabotage of my literary life.

ব্যক্তিগত জীবনের সীমাহীন দুর্ভোগ অনিশ্চয়তার মধ্যেও উপন্যাস লেখা নিয়ে জীবনানন্দের মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলছে। এসময়ে তিনি দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রভাকর সেনের। প্রভাকর সে সময় তরুণ মেধাবী পাঠক যিনি তাঁর কবিতা ব্যাখ্যা করে তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন। প্রভাকরের সঙ্গে কফি হাউসে বসে জীবনানন্দ আলাপ করেছেন উপন্যাস নিয়ে-

With Pravaker I go to coffee house, talks about novels and novel writing about my novels of 22/25 years ago-will they hit now? Those novels a problem, what to do with them? Revere them? Have them fair copied (by relevant persons available in call, As stated by Dharamdas Mukhaerjee?How to fair spent in writing new novels .

প্রভাকর সম্ভবত জীবনানন্দকে উপন্যাস লেখার ব্যাপারে উৎসাহিতই করেছেন। সেই কালো ট্রান্স থেকে উদ্ধার করা উপন্যাসগুলো লেখার তারিখ লক্ষ করলে দেখা যায়, তিনি সেগুলো কোনো কোনোটা মাত্র তিন থেকে চার দিনের ভেতর টানা লিখে শেষ করেছেন।^১

১৬.০৬.১৯৫০ তারিখে সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা এক চিঠিতে জীবনানন্দ লিখেছেন-

‘বেশি ঠেকে পড়েছি, সেজন্য বিরক্ত করতে হলো আপনাকে। এখুনি চার পাঁচশ টাকার দরকার, দয়া করে ব্যবস্থা করুন। এসঙ্গে পাঁচটি কবিতা পাঠাচ্ছি। পরে প্রবন্ধ ইত্যাদি (এখন কিছু লেখা নেই) পাঠাব। আমার একটি উপন্যাস (আমার নিজের নামে নয়-ছদ্মনামেই) পূর্বশায় ছাপাতে পারেন, দরকার বোধ করলে পাঠিয়ে দিতে পারি।

দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের কাছেও উপন্যাস লেখার কথা বলেছিলেন। পূর্বশায় কিংবা দেশ, কোনো কাগজেই জীবনানন্দের কোনো উপন্যাস বের হয়নি। দুটি কারণে হয়তো-

(ক) কেউ তাঁকে আগাম টাকা দেয়নি।

(খ) কিংবা উপন্যাস নিয়ে জীবনানন্দের নিজেরই কোনো দ্বিধা ছিল।^২

ধারণা করা যায়, জীবনানন্দ দাশ সচেতনভাবেই উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলেন। The Bengali novel Today ইংরেজিতে লেখা প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশ তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ প্রমুখের উপন্যাসের কঠোর সমালোচনা করেছেন-

a) The wide experience of Tarasankar has undoubtedly enabled him to enliven the theme of the novel, but not to do very much more. As we pass on from his rarly novels by way of kobi and sandipan pathsala to his latest book, Hansuli Banker Upakatha, we are by and by admitted to varied strands of fresh and stimulating expreience, but never to that perfect and wise disposal of them as might make one or two of his novels unquestionably great out of the immense substance of his experience.^৩

b) ‘But the imagination of Bibhutibhusan, despite its wonderful distinction, is not of the Tolstoyan sort nor even is it of James’s or Tagore’s or Thomas Nann’s Keen and classic type.’^৪

c) Manik’s Padma Nadir Majhi however is a more weighty novel. But it must not be aligned with the greatness of novels such as War And Peace, Crime And Punishment, Ulysses, Joseph and his brothers and the like...he has retired onto the private chamber of his sensibility.^৫

সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের তিনি যে ভঙ্গিতে তুলনা করেছেন, টলস্টয়ের সঙ্গে বিভূতিভূষণের, রবীন্দ্রনাথের গোরার সঙ্গে মানিকের পুতুলনাচের ইতিকথা’র তুলনা কিংবা ‘মানিক আপন অনুভবলোকের’ ‘প্রাইভেট চেম্বারে’ আবদ্ধ হয়ে গেছেন’ অথবা ‘তারাশঙ্করের উপন্যাসে অনেক সজীব অভিজ্ঞতা আছে, তবু প্রশ্নহীনভাবে মহৎ উপন্যাস লেখা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি’ এরকম রূঢ় মন্তব্য থেকে বোঝা যায় উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর

বৈশ্বিক দৃষ্টি, সুউচ্চমান নিয়ে ভেবেছেন। তাঁর ট্রান্সভর্তি খাতা থেকে পাওয়া ইংরেজিতে আরো দুটি প্রবন্ধ ‘The novel in Bengal’ ‘the future of the novel’ এবং শরৎচন্দ্র, প্রভৃতি প্রবন্ধ পড়লে সমকালীন উপন্যাস সম্পর্কে জীবনানন্দের ক্ষোভ আর অভিযোগের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হয়তো এই ক্ষোভ এবং অতৃপ্তি থেকে জীবনানন্দ নিজেই উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন?

কবির লেখা উপন্যাস আসলে তাঁর ‘কবি সত্তার’ বিপরীত কণ্ঠস্বর? যে কথাগুলো জীবনানন্দ কবিতায় বলতে পারছেন না, সেই চাপা পড়া কথাগুলো প্রকাশ করার জন্য তাঁর শিল্পসত্তা ব্যাকুল ছিল, সেই তাড়া থেকেই জীবনানন্দ উপন্যাস লিখেছিলেন? আত্মজীবনের দিকে তাকালে দেখা যায় ৯মে ১৯৩০ সালে ঢাকা ব্রাহ্মণ মন্দিরে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবার পর নতুন বউ নিয়ে তিনি বরিশালে ফিরে যান। বিয়ে উপলক্ষ্যে দিল্লির রামযাশ কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছিলেন, ছুটি বাড়ানোর দরখাস্ত পাঠালে কর্তৃপক্ষ ছুটি না বাড়িয়ে উল্টো তাঁকে ‘কলেজে যোগদান করার দরকার নেই’ বলে জানিয়ে দেন। ঘরে সদ্য বিয়ে করা স্ত্রী, সংসারে অর্থের টানাপোড়েন, বছর ঘুরতেই কন্যা মঞ্জুশ্রী জন্ম হয়। এই অবস্থায় স্ত্রী লাভণ্যের শরীর মন বিগড়ে যায়। লাভণ্য সববিছুর জন্য জীবনানন্দকেই দোষারোপ করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে কথা বন্ধ, খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দরজার খিল লাগিয়ে বসে কাঁদতেন। না খেয়ে মরে যেতে চান-বাড়ির সবাই মিলে বুঝিয়ে তারপর তাঁকে খাইয়েছেন। জীবনানন্দকে অপদস্ত করে ধুলায় মিশিয়ে দিতে চাচ্ছেন, মুক্তি চাচ্ছেন। কীভাবে মুক্তি দেবেন তিনি ভাবছেন। শীতের রাতে অন্ধকারে পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করে কি তাঁকে মুক্তি দেবেন।^৬ বোঝা যায়, যে শুভস্বপ্ন দিয়ে জীবনানন্দ জীবন শুরু করতে চেয়েছিলেন অচিরেই লাভণ্যর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এই অবস্থায় জীবনানন্দ চাকরির খোঁজে কলকাতায় গিয়ে একটা মেসে ওঠেন। মেসের খরচ, খাওয়ার খরচ মেটানোর জন্য একটা টিউশন জোগাড় করলেন। ছোটভাই অশোকানন্দ আবহাওয়া অফিসে চাকরি পেয়ে জীবনানন্দকে এবং বরিশালে সংসারের জন্য টাকা পাঠাতেন। ১৯৩১-৩২ সালে লেখা ডায়রি থেকে জানা যায়, শুধু অপমান, গ্লানি নয়, চাকরির জন্য কত কুকুর বিড়ালের কাছে তিনি নতজানু হয়েছেন। এসময় কবিতা লেখা প্রায় বন্ধ। বুদ্ধদেব বসুর প্রগতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপতো, সেটা বন্ধ কালি-কলম বন্ধ, কবিতা

ছাপানোর আর জায়গা কোথায়? ঐ দীনহীন, খাদে পড়া, জীবনে জটাজালে আটকে পড়া গ্রহিমোচনের উপায় হিসেবে জীবনানন্দ উপন্যাস লেখার অভিনব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, লিখলেন উপন্যাস। প্রকাশের জন্য নয়, আত্মমুক্তির জন্য। জীবনানন্দের উপন্যাস সর্বাংশে আত্মজৈবনিক। নিজের জীবনের সংকট, বিয়ের পর ওলটপালট হয়ে যাওয়া দাম্পত্য জীবনের ধারাবিবরণী হয়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাস। প্রায় উপন্যাসে দেখা যায় মূল চরিত্রের চাকরি নেই, সে নববিবাহিতা, স্ত্রী সন্তান থাকে মফস্বলি, স্ত্রী বা প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন-অর্থাৎ নিজের কথাই, উপর্যুপরি উত্থাপন, ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। এক উপন্যাস থেকে অন্য উপন্যাসে শুধু নামগুলো বদলে দিয়েছেন। কেন এরকম আত্মচরিত্রের অবিকল অনুসরণ করেছেন জীবনানন্দ?

আসলে উপন্যাসে ‘বাস্তবের’ মুখোমুখি দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলেন জীবনানন্দ, যে বাস্তবতা তিনি ঠিক অতিক্রম করতে পারছিলেন না। যে বাস্তবের অভিঘাতে তিনি পর্যুদস্ত, পরাভূত, ক্লান্ত, নিমজ্জিত। সে বৃত্তান্ত প্রকাশ করার জন্য কবিতার স্পেস জুতসই নয়, ছোট। সে রিয়ালিটির লড়াই মোকাবেলার উপযুক্ত স্পেস হচ্ছে উপন্যাস। তাই উপন্যাস ব্যক্তি জীবনকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি?

১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে কলকাতা প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে বসে লেখা সফলতা নিখলতা/ নভেলের পাণ্ডুলিপি উপন্যাসের সংলাপ-

‘মনোরঞ্জনবাবু নলে মুখ দিলেন। বললেন-

-কোনও চাকরি পাচ্ছেন না বুঝি?

-না।

-এক্কেবারে কিছই না।

-কিছই না।

-আমিতো আপনাকে কোনও সাহায্য করতে পারলাম না।

-কী করে পারবেন? যাঁদের হাতে কাজ দেবার ভার তাঁরাও তো পারছেন না।

...

-ব্যবসা আমি করব না কমল।

-কী করবে তাহলে?

—আমি নভেল লিখিব।

কমল কয়েক মুহূর্ত আড়ষ্ট হয়ে বসে থেকে শেষে চক্ষুস্থির করে বললে—

—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে?

—কেন?

—ওই সব ডিটেক্টিভ নভেল লিখবার প্রকৃতি হল তোমার? কোনও ভদ্রলোকেও কি ঐগুলো পড়ে?

—ডিটেক্টিভ কেন?

—কী লিখবে তা হলে?

—আমি যা লিখতে পারি তাই লিখব।

—সে জিনিসের নাম নেই কিছু?

—নভেলের পাণ্ডুলিপি।^৭

এটা উপন্যাসের সংলাপ বলে মনে হয় না, জীবনানন্দের নিজের সঙ্গে নিজে আলাপ বলে মনে হয়। আত্মকথন তার ‘কবি সত্তার’ বিপরীতে এই মনোকথন উপন্যাস লেখা না লেখা নিয়ে আত্ম দ্বন্দ্বেরই বহিঃপ্রকাশ। আমরা চার জন উপন্যাসের একটি উদ্ধৃতি—

‘অনাথ মনে মনে ভাবত সে একদিন এমন একখানা উপন্যাস লিখতে পারবে যার ইংরেজি অনুবাদ করে বিলেতি পাবলিশারের হাতে দিয়ে সে অন্তত হাজার পঞ্চাশেক টাকা পাবে—

টাকাই শুধু অনাথের উদ্দেশ্য নয়—যশও সে চায়।... অনাথ বলেছিল সে চোদ্দ বছরে থেকেই লিখছে এখন তার বয়স ত্রিশ। এর মধ্যে সে পনেরোখানা উপন্যাস ও আড়াই শো গল্প লিখেছে। কিন্তু এসবের প্রায় কিছু তার কাছে নেই। অনেক লেখা উইয়ে কেটেছে, বাকিগুলো সে নিজেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।^৮

একটা কথা ভেবে সবচেয়ে আশ্চর্য হই এই যে, এত লিখেও সে উপন্যাসের চরিত্রের মুখ দিয়ে বলা এই কথন আসলে জীবনানন্দ দাশের স্বীকারকৃতি এ জীবদ্দশায় তাঁর কোনো উপন্যাস পত্রিকা কিংবা প্রকাশককে ছাপাতে যায়নি।’

তার উপন্যাস রচনার মানস পটভূমি, তীব্র বাস্তবতা, যে বাস্তবতাকে অতিক্রম করা বা উপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আত্ম-চারিত্র্য তাঁর

উপন্যাসে এভাবে ঢুকে পড়েছে। জীবনানন্দ নিজেই হয়ে উঠেছেন তাঁর উপন্যাসের নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র। তবে তাঁর উপন্যাস রচনা পদ্ধতিগতভাবে সমকালীন অন্যদের থেকে আলাদা এবং ব্যতিক্রমধর্মী ছিল।

বাংলা উপন্যাসের শিল্পতাত্ত্বিক ধারণা ইউরোপীয় আধিপত্যবাদী ধারণা থেকে তৈরি হয়েছে, অনেকটা উপনিবেশায়নের মতো করে। এর বিপরীতে দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০) প্রস্তাব করেছেন বাংলা উপন্যাস বিবেচনার নতুন ধারণা। উনিশশতকে কলকাতায় ইংরেজ প্রশ্রয়ে যে আধুনিকতার জন্ম হয়েছিল, তার চরিত্র বিচার করতে গিয়ে দেবেশ রায় আধুনিকতার দুইটি স্তর শনাক্ত করেছেন। প্রথম স্তর ঈশ্বরগুপ্ত ও প্যারীচাঁদ মিত্রে আধুনিকতা। এদের আধুনিকতা মাটিলগ্ন, অধিক জনসম্পৃক্ত ছিল। দ্বিতীয় স্তর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—এরা রূপান্তরিত জনগোষ্ঠীর নতুন গড়ন প্রাপ্ত ইংরেজ রুচির অনুকূলই বিকশিত।^৯ ইংরেজ উপনিবেশায়নের ফলে বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই বোধ কাজ করেছিল যে,—ভারতীয় সভ্যতার চাইতে ইংরেজ সভ্যতা উন্নত, ভালো, এবং ইতিবাচক। এই ‘উপনিবেশিক মানসিকতা’ থেকেই তারা ভারতীয় আচার-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ভাষা, নৈতিকতাকে হীন জ্ঞান করে ইংরেজ প্রবর্তিত কাঠামোর নয়া জামানার মানুষ হয়ে ওঠে। এই নয়া জামানার মানুষগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা দরকার। আমজনতার সঙ্গে এদের দূরত্ব ছিল। এরা বিদ্যায়তনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল। শ্রেণির দিক থেকেও এরা কলকাতার এলিট-উচ্চশ্রেণিভুক্ত ছিল। কলকাতার বাইরে লন্ডনের দিকে এদের যোগাযোগ বেশি ছিল, অন্যদিকে গ্রামের কৃষক, সাধারণের সাথে তাদের দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়। এটাই হচ্ছে কলকাতা কেন্দ্রিক ‘আধুনিকতা’ বা ‘আধুনিকতাবাদী সাহিত্যের’ জনবিচ্ছিন্নতার ইতিহাস। সেটা ঈশ্বরগুপ্ত-প্যারীচাঁদ থেকে মাইকেল-বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে বিশশতকের প্রথমার্ধ তিরিশি পঞ্চ কবির রচনাতেও তা প্রতিফলিত। তিরিশি পঞ্চ কবির রবীন্দ্র দ্রোহ, রবীন্দ্র অতিক্রমের মধ্যে ভাব ও রূপকের আড়ালে প্রচণ্ডভাবে ‘ইউরোসেন্টিসিজম’ ছিল। যা ‘মধ্যযুগীয়’ আখ্যা থেকে তিরিশি কবিদের পরিত্রাণ দেয় এবং একটি শব্দ ‘আধুনিকতা’। এই ‘আধুনিকতা’ সূত্রেই তিরিশি কবিরা গ্রাহ্য, গুরুত্ব এবং পরিচিত হয়ে ওঠেন। ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর উপনিবেশিক ইংরেজ সংস্কৃতির এই আরোপণকে তুলনা করা যায় একমাত্র ধর্মণের সঙ্গেই।